জিয়া তুমি চির অম্লান

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১১তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

জিয়াউর রহমান

এ দেশ, তার মাটি আর মানুষকে ভালোবেসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বার্থ চিন্তা নয়, শুধু এ দেশের মানুষের কল্যাণের চিন্তাকে ঘিরে আবর্তিত হত তাঁর জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত। একটু বিশ্রাম কিংবা অবসর নেবার প্রশ্ন তুললে তিনি সব সময় বলতেন, 'আমাকে কাজ করতে হবে। নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।' তাই দেশের ভেতরে তিনি যেমন সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন কাজে তেমনি দেশের বাইরে গেলেও তাঁর মন পড়ে থাকতো এর মাটি আর মানুষের কাছাকাছি।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় সফর ছিল পশ্চিম জার্মানীতে। ফ্রাংকফুর্ট থেকে স্বদেশে ফেরার পথে বিমানের কেবিনে তিনি কাগজ কলম নিয়ে পাশে বসালেন উপদেষ্টা দাউদ খান মজলিসকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও তার ভিত্তিতে এ দেশের উন্নয়ন সাধন সম্পর্কে তাঁর একান্ত ভাবনা তুলে ধরলেন দীর্ঘ তিন ঘন্টার আলাপে। সেই আলাপেরই ফসল আমাদের আজকের রচনা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত তিরিশে মে ১৯৮১ তারিখের কালরাতে এই রচনার মূল খসড়াটি তার সঙ্গে ছিলো—এটা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে, হয়তো এর কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। এর যে অনুলিপিটি জনাব দাউদ খান মজলিসের কাছে ছিল, সেটাই এখন হুবহু ছাপা হলো।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন শত শত বর্ষ ধরে এদেশের আপামর জনগণের অন্তরে চিরজাগরূক রয়েছে যুগ যুগান্তরের দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ের মর্মমূলে নিহিত তাদের সর্বউৎসাহ, উদ্যোগ ও প্রেরণার উৎস এই দর্শন। এই দর্শনে নিহিত রয়েছে বাস্তব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী যা দেশের ঐক্যবদ্ধ জনগণকে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপযোগী বাস্তবমুখী ও সময়োচিত শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করবে, জাতিকে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এবং বিশ্বজাতির দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদা ও গুরুত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

এর জন্য প্রয়োজন সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের বিপুল জনশক্তির ব্যবহার যে জনশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে তার অপচয় করা হয়েছে। তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে গণমুখী কর্মসূচী দেশের ভেতরের ও বাইরের স্বার্থবাদী মহল ও লোকজনের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হবে, কারণ আমাদের প্রগতিশীল ও গণমুখী কর্মসূচী স্বার্থবাদীদের সমাজবিরোধী তৎপরতা ও একচেটিয়া মুনাফা লাভের ঘৃণ্য পথ বন্ধ করে দেবে। সেজন্য গ্রাম পর্যায়ে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে ও সব বয়সের প্রতিটি মানুষের কাছে সত্যিকারভাবে পৌঁছানো আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। গণসাক্ষাতের এই প্রয়াসকে হতে হবে বিরামহীন, ঘনিষ্ঠ ও সমাদৃত। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার করুণাতেই আমাদের লক্ষ বাস্তবে রূপ নেবে তাই এতে ধর্মের যথাযোগ্য মর্যাদা ও প্রধান ভূমিকা থাকবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি আমাদের অটুট ও অবিচল বিশ্বাস থাকতে হবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে আমাদের দর্শন এদেশের মাটি, পানি ও গণমানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে এবং তার যে কোন বিচ্যুতি আমাদের জন্য ধ্বংসই ডেকে আনবে। এদেশের মাটি ও পানি ও জনগণের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি নিহিত রয়েছে তাকে সংঘবদ্ধ ও সমন্বিত করার জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

নীতিসমূহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে। এর জন্য ইতিবাচক নমনীয়তা একটি স্থায়ী অপরিহার্য নিয়ামক। এতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন স্থান নেই।

আমাদের মূল লক্ষ্য তথা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে রয়েছে যে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। শোষণমুক্ত সমাজ মূলত বোঝায় ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক চাহিদা পূরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। মূল এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়। শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমেই এসবের সমাধান করতে হবে যে বিষয়ে পরে আরো বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে একটি শোষণমুক্ত সমাজ যা অত্যন্ত বাস্তব ও প্রগতিশীল একটি সমাজ যাতে থাকবে সমতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার।

এই পর্যায়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা ছাড়া জাতীয়তাবাদী দর্শনের আন্দোলন এবং তার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ হয়ে পড়বে অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। আমরা বলতে পারি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে মোটামুটি সাতটি মৌলিক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে যা হচ্ছে (১) বাংলাদেশের ভূমি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমানায় মধ্যবর্তী আমাদের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক এলাকা; (২) ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে দেশের জনগণ; (৩) আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা; (৪) আমাদের সংস্কৃতি-জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার ধারক ও বাহক আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি; (৫) দুশো বছর উপনিবেশ থাকার প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক বিবেচনার বৈপ্লবিক দিক; (৬) আমাদের ধর্ম-প্রতিটি নারী ও পুরুষের অবাধে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতি পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা; (৭) সর্বোপরি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ যার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন বাস্তব ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ করা যায়। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে সংকীর্ণ পরিসরের এই দেশের পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিমে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া। বাংলাদেশ এ দুটি অঞ্চল বা দুটি উপ-মহাদেশের সেতুবন্ধ স্বরূপ। এই কারণে আঞ্চলিকভাবে এবং সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিশেষ কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। এই কারণেই সুদূর অতীত থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধের দখল ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এদেশ বারংবার আক্রান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদেশের জমির বিপুল উর্বরা শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য শত শত বর্ষ ধরে বারংবার আক্রমণকারীদের এদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ করে এসেছে যে কারণে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শাসন ও পরিপূর্ণ শোষণের শিকার হয়েছি। এই মহান দেশের জনগণ দুর্বল হয়ে থাকলে ভবিষ্যতেও সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে পড়তে পারে। সেজন্য এদেশের জনগণকে নিজেদের সত্তা রক্ষা এবং দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্ষার ব্যবস্থা শিখতে হবে।

আমাদের ভাষা বাংলা। অন্যান্য দেশেও বাংলা ভাষাভাষী রয়েছে, যাদের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে, তারা পৃথক সত্তা, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও মননশীলতার অধিকারী, তাদের মানসিকতা ভিন্ন এবং তারা পৃথক দেশের অধিবাসী। সেজন্য বাংলা ভাষাভাষী হলেও আমাদের যথার্থ পরিচয় বাংলাদেশী। দেশজ কৃষ্টির ধারক ও বাহক আমাদের সংস্কৃতির রয়েছে বিকাশ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির এক অনন্য সাধারণ ঐতিহ্য যা বলিষ্ঠ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ দেশের সংস্কৃতিকে দিয়েছে যে দুর্বার শক্তি সেই চেতনার আলোকে এই সংস্কৃতি নিজস্ব পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আরো মহিমামণ্ডিত রূপ লাভ করেছে। বাইরে থেকে আমাদের এই সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চলছে এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ছত্রচ্ছায়ায় আন্তর্জাতিক ধুয়ো তুলে একে বিদেশী রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বহু বছরের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে আমাদের অর্থনীতি হয়েছে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, জাতীয় সম্পদ হয়েছে লুণ্ঠিত এবং মানব সম্পদ নিষ্পীড়িত। সেজন্য আজ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের বিপুল জনসংখ্যা এবং স্বল্প আয়তনের প্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের গতিশীল প্রেরণা যে চেতনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষ জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়নে শরীক হবে। আমাদের মনে ধর্মের বিশেষ স্থান রয়েছে। আল্লাহতায়ালা এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ ও অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। সেজন্য প্রতিটি মানুষের তার নিজের ধর্ম পালনের পরিপূর্ণ অধিকার আমাদের কাছে স্বীকৃত সত্য।

সর্বোপরি আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একমাত্র আমরাই সর্বাধিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলাম এবং এই অঞ্চলের অন্য কোন দেশকে তার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের মধ্যে ত্যাগের সার্বভৌমত্বের যে মহান প্রেরণায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে সে মহান চেতনা ও প্রেরণার ব্যাপারে কোন আপোস নেই। যারা আমাদের দেশ জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং তাদের বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে পবিত্র ধর্মের নামে মিথ্যা প্রতারণা ও চক্রান্তের জাল বুনে বিদেশী প্রভুদের নির্দেশ মেনে কাজ করে তারা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও তার জনগণের পরম শত্রু। এমনভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে যাতে তারা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এর ফলে জাতি নিরুপদ্রবে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশের জনগণের জন্য নিজেদের ত্যাগ ও পরিশ্রমে বাস্তবায়নাধীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে পারবে। কাজেই এ কথা বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক কোন দর্শন নয়। বস্তুত বিভিন্ন উপাদান এই দর্শনের ভিত্তি এবং সেজন্য তা পূর্ণাঙ্গ ও সাবার কাছে সমাদৃত। এর কোন একটি মৌলিক উপাদান দুর্বল হলেও অন্য সব উপাদানের সম্মিলিত শক্তি ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। এখন আমরা শোষণমুক্ত সমাজ তথা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং পরিপূরক বিষয় প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজে সম্পদ ও সার্ভিসের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হওয়া উচিত। অবশ্য এই কাজ সহজ নয়। যারা সমাজের সম্পদ ও সার্ভিস একচেটিয়াভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে এই কাজে তাদের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসবে। কিন্তু গণসংগঠন এবং পরিকল্পিত ও সুসংহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা এ সামাজিক অন্যায় ও বিরোধিতার যথাযথ মোকাবিলা করতে পারব। এই মুনাফাখোরী স্বার্থবাদী মহল বিরোধিতার সম্মুখীন হলে আরো নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারব যে আমাদের পথ সঠিক হওয়ায় তাদের এই বিরোধিতা এবং সেজন্য এই বিরোধিতার মোকাবিলা ও তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখাতে হবে। এছাড়া অব্যাহতভাবে জনগণের শক্তিকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে হবে এবং তাদের বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার কারণগুলো তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে। শহর ও পল্লী এলাকায় তাদেরকে সুসংগঠিত করতে হবে এবং সেই কাজ করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্তরায় হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা না দেখা দেয়। আমাদের দর্শনের আলোকে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে জনগণের সর্বাত্মক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যার মাধ্যমে বহু শতক ধরে অগণিত জনগণের সুপ্ত সুবিশাল অন্তর্নিহিত শক্তি বন্ধনমুক্তি পেয়ে জাতীয় কাঠামোর প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়ন সাধন ও সুদৃঢ়করণের কার্যকরী হতে পারে। জনগণের সর্বাত্মক স্বাধীনতার অর্থ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বাস্তবমুখী রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর দর্শনে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিটি মানুষকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও নিষ্ঠাবান করে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেককে দেশ ও তার জনগণ এবং বিশ্ববাসীর কল্যাণ করার সুযোগ করে দিতে হবে। একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে জাতি হিসাবে আমরা নিজেরা শক্তিশালী সুদৃঢ় ও সফল কর্মী না হতে পারলে আমরা বিশ্বমানবতার সেবা করতে পারব না। পূর্বে উল্লিখিত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে আমাদেরকে বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে যাতে জাতীয় স্বার্থেই গঠনধর্মী বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকবে। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ এসব চিন্তা ও কাজের মূল পথনির্দেশিকা হবে।

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এমন এক বিশ্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের কর্মসূচী জনগণকে নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক করে দেয় যার ফলে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনগণের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত শক্তি কার্যকরী হতে ব্যর্থ হয় এবং দুঃখ, কষ্ট, ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব সম্পদ ও সম্ভাবনাময় দ্বার আজ যখন মানুষের অগ্রগতির ও জাগরণের পথরুদ্ধকারী সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণের আদর্শ মানুষের একক ও সম্মিলিত কাজের শক্তি শুধুমাত্র খর্ব করে না বরং তা মানব সমাজকে অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাদগামী করে পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবী আত্মবিনাশ ডেকে আনে। নিয়ন্ত্রিত ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তারা স্বভাবতই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হবে এবং যদিও তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা পূর্বের আদর্শবাদ ভিত্তিক থাকবে না, যথার্থভাবেই তা হবে প্রতিক্রিয়াশীলতা। যদি তারা পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে থাকে তবে তারা বহুমুখী সমস্যার আবর্তে ক্রমান্বয়ে আত্মবিনাশের সম্মুখীন হবে। এই ক্রমিক প্রক্রিয়া অঞ্চল বিশেষ ও বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা মানুষকে স্বাধীন

(২-এর পৃঃ দ্রঃ)

জিয়ার রাজনীতির বিকল্প নেই

এমাজউদ্দীন আহমদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক সন্ধিক্ষণে প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক উইনস্টোন চার্চিল (Churchill) কমন্স সভায় এক ভাষণে বলেন : 'আমাদের আলোকবর্তিকা অতীতে শুধু মিটমিট করে জ্বলেছে। বর্তমানে তা হয়েছে উজ্জ্বল এক শিখা। ভবিষ্যতে তা হবে এমন এক আলোক রশ্মি যা সমগ্র জলস্থলকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে' ('In the past we have had a light which flickered in the present we have a light which flames, and in the future there will be a light which shines over all the land and sea')। ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বরে চার্চিল যে আলোর কথা বলেছেন সে আলো ব্রিটেনের নেতৃত্ব, ব্রিটেনের ভাবমূর্তি, বিশ্বসভায় বৃটেনের অবস্থান।

নেতৃত্বের যে স্পর্শমণি সংকটের আবর্তে নিপতিত জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেয় চার্চিলের সেই অবিস্মরণীয় মেধা এবং ধৈর্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড থেকে ব্রিটেনকে শুধু সযত্নে রক্ষাই করেনি, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ব্রিটেনের জন্যে স্থায়ী করে সম্মানজনক এক অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রাণ পাওয়া বাংলাদেশে, ১৯৭৫ সালের পরবর্তী পর্যায়ে, জিয়াউর রহমানের সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব বাংলাদেশেও সৃষ্টি করে সৃজনশীলতার এমন তরঙ্গমালা যার রেশ তাঁর মৃত্যুর এক দশক পরেও জাতীয় জীবনে অনুভূত হচ্ছে। আজো রাষ্ট্রপতি জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের অন্তরঙ্গ সুর সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করে তিনি বলেছিলেন : 'এই দর্শনে নিহিত রয়েছে বাস্তব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী যা দেশের ঐক্যবদ্ধ জনগণকে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপযোগী বাস্তবমুখী ও সময়োচিত শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংবদ্ধ করবে। জাতিকে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রগতির ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে এবং বিশ্বজাতির দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদা ও গুরুত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।"

তৎকালীন বাংলাদেশ রাজনীতির উষর মরুভূমিতে তাঁর সৃজনশীল নেতৃত্ব, সঠিক দিকনির্দেশনা, জাতীয় জীবনকে সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার নির্মোহ প্রয়াস এক মরুদ্যানতুল্য। জনগণের কাছাকাছি এসে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে, তাদেরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তিনি নির্ধারণ করলেন বাংলাদেশের জন্যে নতুন রাজনীতি। সৃষ্টি করলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নতুন প্রবাহ। ভিত্তি স্থাপন করলেন জাতীয় ঐক্যের নতুন সৌধের। স্থির করলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন গন্তব্য। এসব লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর পথ এখনো আলোর পথ। তাঁর মত এখনও অভ্রান্ত। তাঁর আদর্শ এখনো লক্ষ কোটি হৃদয়ে জাগায় নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। প্রেরণা যোগায় দুর্লঙ্ঘ বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করার অদম্য স্পৃহা। জিয়া ছিলেন জনগণের আপনজন। জনগণের মনের মণিকোঠায় জিয়া তাই আজো অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী।

অন্য দশজন জেনারেলের মতো কূটকৌশলের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেননি। ক্ষমতাই জিয়ার কাছে ধরা দেয়। এগিয়ে আসে ধীরপদে, জাতীয় জীবনের সংকটকালে, ষড়যন্ত্রের অন্ধকার কুঠুরীর সব বাতায়ন গুঁড়িয়ে। তাই জিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ক্ষমতা হিসাবে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করেছেন সীমাহীন দায়িত্ব হিসাবে, জনকল্যাণ অর্জন এবং জাতীয় ভাবমূর্তি সমুন্নত করার দায়িত্ব হিসাবে। জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার হিসাবে। সঠিক নেতৃত্বের ভূমিকা এমনি হয়, সর্বত্রই।

যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কমন্স সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে চার্চিল ব্রিটিশ জাতিকে উদাত্ত এক আহবান জানিয়ে বলেছিলেন : "আমাদের যাত্রাপথে মৃত্যু ও দুঃখই আমাদের সাথী। দুর্দশাই আমাদের আবরণ। অবিচল নিষ্ঠা ও ধৈর্যই আমাদের বর্ম। আমাদের সম্মিলিত হতে হবে। হতে হবে অটল এবং কঠোর" ('Death and sorrow will be the Companions of our jorrney; hardship our garment;; Constancy and Valour our only shield. We must be united, We must be undaunted, We must inflexible.') রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে জিয়াউর রহমানও উপলব্ধি করেন, অগ্রগতির জন্যে জাতিকে চলতে হবে দীর্ঘ পথ। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। এদেশের 'মর্যাদা, পানি ও জনগণের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি নিহিত রয়েছে" তাকে জাগ্রত করতে হবে। তাঁর নিজের কথায় : 'এদেশের জমির উর্বরাশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য শত বর্ষ ধরে বারংবার আক্রমণকারীদের এদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ করে এসেছে। এ কারণে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শাসন ও পরিপূর্ণ শোষণের শিকার হয়েছি। এই মহান দেশের জনগণ দুর্বল হয়ে থাকলে ভবিষ্যতেও সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে পড়তে পারে'। তাই তিনি আহবান জানান, 'অব্যাহতভাবে জনগণের শক্তিকে সুদৃঢ় এবং সুসংহত করতে'।

বক্তব্য রেখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। জনগণের অজেয় শক্তি ও শ্রমের সাথে নিজের শ্রম মিশিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। সবাইকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। জনগণের ভাষায় তাদেরই প্রতীক সঙ্গে নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন জনকল্যাণের স্বার্থে। যে জাতি এক রক্তের সাগর সাঁতার কেটে তুলে এনেছে স্বাধীনতার লাল গোলাপ, পঁচাত্তরের শেষপ্রান্তে সে জাতির দিকে তাকিয়েই তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেন, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের দ্বন্দ্বে তাঁর সাধের জন্মভূমির জীবন পীড়িত, ক্লিষ্ট। তিনি অবলোকন করেন, ডান-বামের টানা-পোড়েনে জাতীয় ঐক্য ছিন্ন প্রায়। সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান-প্রতিঅভ্যুত্থানে জাতীয় জীবন ক্ষতবিক্ষত। রাজনীতি নির্বাসিত। রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থার নামে ব্যক্তিত্বনির্ভর, অগণতান্ত্রিক শাসনে চারদিকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণপণ করে লড়েছে তা সমাজ থেকে বিতাড়িত। সমাজতন্ত্রের নামে উৎপাদনে উপাদানসমূহ কিছুসংখ্যক লোভাতুর দুর্নীতি পরায়ণদের করতলগত। সার্বিকভাবে অর্থনীতি পর্যুদস্ত। দিকনির্দেশহীন রাজনীতি কিছুসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষীর কবলে।

শুধু জাতীয় কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নিঃসঙ্গ, অবহেলিত, মাত্র ক'বছরে তৃতীয় বিশ্ব থেকে ছিটকে পড়েছে সবচেয়ে অনগ্রসর রাষ্ট্রমণ্ডলের নিম্নসারিতে। সীমাহীন দারিদ্র্য ও উন্নত বিশ্বের অনুকম্পা নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, 'তলাহীন ঝুড়ির' প্রত্যয়কে অর্থপূর্ণ করতে। বাংলাদেশের এমনি দুর্দিনে জিয়া এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। এলেন জনতার মিছিলের অগ্রসারিতে। দেখলেন হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, রক্তাক্ত মাতৃভূমিকে। জয় করলেন জনগণের হৃদয়। তার পরের ইতিহাস সবার জানা।

গণতন্ত্রের উষ্ণ প্রবাহে জাতীয় জীবনের চারদিক তখনও সিক্ত হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু হিমশীতল অগণতন্ত্রের নির্মম প্রকোষ্ঠে বহুদলীয় গণতন্ত্রের দল বিকশিত হতে লাগল তার স্পর্শে। তথাকথিত সমাজতন্ত্রের ঊষর ভূমি তখনও শস্য-শ্যামল হয়ে উঠলো না বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত ও বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে অবাধ অর্থনীতির বীজ উপ্ত হলো তার নেতৃত্বে। জাতীয় অনৈক্যের প্রতীক ডান-বামের তীব্র প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের বিস্তীর্ণ প্রবাহে ডান-বাম কেন্দ্র সংন্যস্ত হলো এমন সুষমভাবে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রত্যয়ে একাত্মতার সুরের ঝংকার সৃষ্টি হলো দশদিকে। সার্বিকভাবে অর্থনীতি তখনও প্রাণবন্ত হয়নি বটে, কিন্তু মর্যাদা আর মানুষের প্রতি গভীর আস্থাশীলতায় তা নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে তার উদ্যোগে। জাতীয় রাজনীতি তখনও জনগণের আশা-আকাংক্ষা ধারণ করতে সক্ষম হয়নি বটে, কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আবারো হয়ে ওঠে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। শুধু জাতীয় পর্যায়ে কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের মৃদু কণ্ঠ দৃঢ় হতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য

(২-এর পৃঃ দ্রঃ)